Swami Vivekananda Advanced Journal for Research and Studies
Online Copy of Document Available on: www.svajrs.com

ISSN:2584-105X **Pg. 205-208**

"নাগিনী কন্যার কাহিনী" - অবলম্বনে নারীদেহ, প্রকৃতি ও ভয়ের আন্তঃসম্পর্ক, একটি Ecofeminist বিশ্লেষণ।

Sampa Roy
Former Student ,Dept. of Bengali ,Netaji Subhas Open University
West Bengal, India
Email Id – samparoy627@gmail.com

Accepted: 25/04/2026
Published: 28/04/2026 ***DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.19854513***

Abstract

তারাশঙ্কর ছিলেন বিংশ শতাব্দীর এক বিশিষ্ট ভারতীয় বাঙালি কথাসাহিত্যিক। রবীন্দ্রপরবর্তী যুগে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পর তারাশঙ্করের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তার রচনায় সমাজের জটিল সমস্যাগুলিকে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রকৃতি, নারী, সমাজের বিভিন্ন কুসংস্কার, নিষ্ঠুরতা, ক্ষমতার অপব্যবহার প্রভৃতি তার রচনার দ্বারা আমাদের কাছে সহজ সরল ভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি ৬৫টি উপন্যাস, ৫৩টি ছোটগল্প সংকলন, ১২টি নাটক, ৪টি প্রবন্ধ, ৪টি স্মৃতিকথা, ২টি ভ্রমণ কাহিনী, একটি কাব্যগ্রন্থ এবং একটি প্রহসন রচনা করেন। তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার, সাহিত্য একাদেমি পুরস্কার, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার অর্জন করেন। এছাড়া তিনি ১৯৬২ সালে পদ্মশ্রী এবং ১৯৬৮ সালে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত হন। তার লেখা উপন্যাস ও ছোটগল্প নিয়ে অনেক জনপ্রিয় চলচিত্র নির্মিত হয়েছে। বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯৮ সালের ২৩ রা জুলাই বীরভূমের লাভপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতার নাম ছিল প্রভাবতী দেবী। তিনি জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করলেও তার মন ছিল সাধারণ মানুষের প্রতি অনুরাগী। তার লেখায় উঠে এসেছে নানা শ্রেণীর মানুষের কথা — যেমন দুলে, বাগদি, কাহার প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ। অন্যদিকে রয়েছে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের কথাও। তিনি সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে যে উপন্যাসগুলি রচনা করেন তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'ধাত্রীদেবতা', 'রাধা', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' ও 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'। এর মধ্যে 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসে তিনি লোকবিশ্বাস, অলৌকিকতা এবং নারী চরিত্রের এক জটিল মেলবন্ধন দেখিয়েছেন। এই কাহিনীতে নাগিনী চরিত্রটি একদিকে যেমন প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, তেমনি অন্যদিকে সমাজের ভয়, কুসংস্কার ও আকর্ষনের কেন্দ্র হিসেবে পরিনত হয়েছে। নাগিনী চরিত্রটি প্রকৃতির প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যদিকে নারীদেহের সঙ্গে সর্পদেহের মিশ্রণে সমাজে সৃষ্টি করেছে ভীতি। অপরদিকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ এই ভীতিকে কাজে লাগিয়ে তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করার চেষ্টা করেছে। এই সমাজ প্রকৃতিকে যেভাবে ধ্বংস করে চলেছে, ঠিক সেইভাবে নারীর নারীত্বকে আঘাত হানার চেষ্টা করেছে কুক্ষিগত মানুষেরা। তারই বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসে।

Keywords: *নারীর দেহ ও প্রকৃতি, প্রকৃতি ও নারীর প্রতি ভয়, নিয়ন্ত্রণের রাজনীতি, অন্যনীকরণ, ভয় একটি সামাজিক নির্মাণ, শোষণ ও নিপীড়ন।*

Introduction

অতি প্রাচীনকাল থেকেই আমরা শুনে এসেছি বিভিন্ন পৌরাণিক গল্প, আদ্ধাত্মিক গল্প, অলৌকিক গল্প ও কাল্পনিক গল্প। তেমনি নাগিনী কন্যার বহু কাহিনী আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে। নাগিনী কথার অর্থ হলো অর্ধেক শরীর মানুষ ও অর্ধেক শরীর সর্প - যা সমাজের পক্ষে একদিকে রহস্যময় ও অপরদিকে ভীতিকর। 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসে নাগিনী চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে সমাজে নারীদেহ, প্রকৃতি ও ভয় - এই তিনটি বিষয়কে একসঙ্গে করে দেখানো হয়েছে।

Research objective:

1. উপন্যাসে নারী ও প্রকৃতির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা।
2. নাগিনী চরিত্রের প্রতীকী অর্থ নির্ণয় করা।
3. Ecofeminist তত্ত্ব প্রয়োগ করে নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করা।

Research question:

1. নাগিনী চরিত্রটি কীভাবে প্রকৃতির প্রতীক হিসেবে কাজ করে?
2. নারী দেহ ও সর্পদেহের মিশ্রণ কী ধরণের সামাজিক ভয় তৈরি করে?
3. পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কীভাবে এই অস্বাভাবিক নারীকে ব্যাখ্যা করে?
4. প্রকৃতি ও নারী - এই দুইয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে?

নারীর দেহ ও প্রকৃতি:

নারীর দেহকে কখনো কখনো রহস্যময় ও অলৌকিক শক্তির আধার রূপে দেখানো হয়েছে। নাগিনী কন্যা সেই রহস্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। তাঁর রূপ আকর্ষিত হলেও তার ভেতরে লুকিয়ে থাকে বিপদ - এই ধারণা সমাজের মানুষের মনে তার প্রতি দ্বৈত মনোভাবের সৃষ্টি করে। অপরদিকে প্রকৃতিও আমাদের কাছে রহস্যময় ও শক্তিশালী। প্রকৃতির এই শান্ত ও সুন্দর রূপের পাশাপাশি আমরা বিভিন্ন সময় নানান প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়ে থাকি। যা অনেক সময় আমাদের কল্পনাকেও অতিক্রম করে। অপরদিকে সাপ সাধারণত প্রকৃতির প্রতীক, কারণ সাপ সাধারনত বিশেষ করে মাটি, জঙ্গল ও নদীর সঙ্গে যুক্ত। নাগিনী কন্যাও তাই নারী ও প্রকৃতির এক ধরণের মিলনকে বোঝায়। তাই এখানে বোঝানো হয়েছে যে, নারীও প্রকৃতির মতো শক্তিশালী, অনিয়ন্ত্রিত ও কখনো কখনো ভয়ঙ্কর হতে পারে।

প্রকৃতি ও নারীর প্রতি ভয়:

মানুষ প্রকৃতির শান্ত রূপ উপভোগ করে থাকে। প্রকৃতি থেকেই সব কিছু নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকে। প্রকৃতির এই সুন্দর রূপ যেমন মানুষ উপভোগ করে তেমনি তাদের মনে মাঝে মাঝেই ভীতির সঞ্চার ঘটে যে, কখন না জানি এই শান্ত প্রকৃতি তার ভয়ঙ্কর অন্তর রূপে এসে সবকিছু তছনছ করে দেবে। এখানে নাগিনী চরিত্রের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর স্বাধীনতা ও অজানা শক্তিকে ভয় করে। এই ভয় অনেক সময় নিজেদের তৈরি কৃত্রিম ভয়, যাতে নারীদের নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। এই কাহিনীতে নারীর দেহ, প্রকৃতি ও ভয় - এই তিনটি বিষয় একে অপরের সাথে জড়িয়ে রয়েছে। তাই নারীকে যেমন প্রকৃতির মতো রহস্যময় বলা হয়েছে আর সেই রহস্য থেকেই ভয় সৃষ্টি হয়েছে।

নিয়ন্ত্রণের রাজনীতি:

নাগিনী কন্যার কাহিনীতে নারীর শক্তিকে অনেক সময় বিপজ্জনক হিসেবে দেখানো হয়েছে। এর মাধ্যমে সমাজকে একটি বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, নারী যদি সম্পূর্ণভাবে নিজের মতো করে স্বাধীন হয়ে যায় তাহলে অনেক সময় ভয়ঙ্কর হতে পারে। এই ধারণা ব্যবহার করে নারীদের শরীর, আচরণ ও স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এটি কল্পনা নয় - এক ধরণের ক্ষমতার রাজনীতি।

অন্যনীকরণ:

অন্যনীকরণ বা অন্যান্যকরণ মানে হলো সাধারণ অবস্থা থেকে কাউকে আলাদাভাবে ভাবা। অর্থাৎ সে আমাদের মতো সাধারণ নয়। সে বিশেষ, সে ভয়ঙ্কর, সে অলৌকিক। এভাবে সাধারণকে অসাধারণ বানিয়ে মূল স্রোত থেকে তাকে আলাদা করে দেওয়া হয়। তার জীবন থেকে অন্য জীবনযাপন করতে বাধ্য করা হয়। তাকে 'অন্য' বলে চিহ্নিত করা হয়। যেমন - নাগিনী কন্যার উপন্যাসে নাগিনী হিসেবে একটি সাধারণ মেয়েকে চিহ্নিত করে তাকে অসাধারণ বানিয়ে তুলেছে। তার বাস্তব জীবন থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে সব কিছু বাস্তব সুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এভাবেই আজও আমাদের সমাজে অনেক সময় অনেক নারীকে 'অন্য' বলে 'ডাইনী' আখ্যা দিয়ে তাকে পুড়িয়ে কিংবা গাছে বেঁধে প্রাণে মারার চেষ্টা করা হোত যা অত্যন্ত ভুল ধারণা বশত মানুষ করে থাকে। এগুলি নিছকই গুজব। কখনোই সত্যি হতে পারে না।

ভয় একটি সামাজিক নির্মাণ:

অনেক সময় দেখা যায় অলৌকিক শক্তির নাম করে অনেক নারী কিংবা পুরুষ নিজেদের অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে জানায়। সাধারণ মানুষ তাদের মনের বিশ্বাস থেকে সেই কথাকে সত্যি বলে মনে করে। তাদের কথায় সাধারণ মানুষ তাদের কষ্ট করে উপার্জিত ধন নষ্ট করে। এই ভণ্ডরা ঈশ্বরের আসল মহিমাকে খর্ব করে। ফলে মানুষের মনে ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস জন্মায়। এই উপন্যাসে সাধারণ মেয়েকে সর্পের সাথে তুলনা করে নাগিনী কন্যা রূপে আখ্যা দিয়ে সমাজে তার প্রতি আলাদা মনোভাব সৃষ্টি করে সেই সাধারণ মেয়েটিকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দিয়েছে। তার শক্তি বা প্রকৃতির সাথে তার সম্পর্ককে ভয়ংকর বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এসবই সমাজের তৈরি ধারণা। যা একটি গুজবে পরিণত হয়ে সমাজে আগ্নি স্ফুলিঙ্গের মতো দ্রুত গতিতে সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। তবে কিছু কিছু ভয় সমাজের মানুষকে নিয়ম মেনে চলতে সাহায্য করে। পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। কিন্তু সমাজ নির্মিত কুৎসিত ভয় মানুষের জীবনকে নষ্ট করে দেয়।

শোষণ ও নিপীড়ন:

এই উপন্যাসে দেখা যায় নাগিনী কন্যার শক্তিকে স্বার্থের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। তাকে প্রতারিত করা হয়েছে, তার দেহকে কাজে লাগিয়ে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। এখানে বোঝানো হয়েছে বাস্তবে কীভাবে নারীর সৌন্দর্য ও ক্ষমতাকে সমাজ নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে তাকে শোষণ করে থাকে। যদি নারী সেই শোষণ মানতে নারাজ হয় তাকে নিপীড়ন করা হয়। তাকে অমানবিক শাস্তি দেওয়া হয়, সমাজ থেকে বাদ দেওয়া হয় এমনকি তাকে ধ্বংস পর্যন্ত করে দেওয়া হয়। এই উপন্যাসে নাগিনী কন্যার করুণ পরিণতি এই নিপীড়নেরই প্রতীক।

Research gap:

'নাগিনী কন্যার কাহিনী' নিয়ে অনেক গবেষক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন যেমন—লোকজ উপাদান, সমাজ চিত্র ইত্যাদি। কিন্তু Ecofeminism এর দৃষ্টিকোণ থেকে এই উপন্যাসের বিশ্লেষণ খুব কম হয়েছে। এই গবেষণায় সেই শূন্যতা পূরণ করার চেষ্টা করা হবে।

Methodology:

বিভিন্ন পুস্তক পুস্তিকা পঠন পাঠনের মাধ্যমে এই গবেষণা সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করা হয়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাগিনী কন্যা উপন্যাসটি পৌরাণিক, লোককথা, কাল্পনিক ও রহস্যময় আধারে লিখিত। তিনি বলেন - **"বৃন্দাবনের কালীদহের কালীগ - কালো ঠাকুরের দম্ভ মাথায় করে কালোদহ ছেড়ে এসে এখানেই বাসা বেঁধেছে।"**[1] যা পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে লেখা হয়েছে। তবে বিশেষ করে পদ্মাপুরাণের কথা এখানে বেশি উল্লেখ আছে। কাহিনীর বেশির ভাগই পদ্মাপুরাণ বর্ণিত। গল্পের শুরুতে দেখা যায়, এক সুন্দরী কন্যা সাধারণ মানুষের মতো জীবন যাপন করলেও তার মধ্যে লুকিয়ে ছিল একটি গোপন রহস্য। সে আসলে ছিল একজন নাগিনী। তার দ্বিতীয় রূপটি ছিল সাপের। সে কথা সে সবার থেকে গোপন রেখেছিল। কাহিনীটি আসলে বেদেদের জীবন যাপন নিয়েই বর্ণিত হয়েছে। বেদেরা সাতালী পর্বতে বাস করত। কথিত আছে চাঁদ সদাগরের নামে বণিকের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করায় চাঁদের ছেলে লখিন্দরের মৃত্যু হওয়ায় বেদেদের সাতালী পর্বতে বাস, জাত, কুল, অন্ন চাঁদবেনে কেড়ে নেন। এবং **"মর্ত্যধামের অধিকারী সাতডিঙা মধুকরের মালিক চাঁদবেনে শিবভক্ত, তবুও বাদ করলে শিবকন্যে বিষহরির সঙ্গে। চ্যাঙ মুড়ি কানি, চ্যাং মাছের মত মাথা, এক চোখ কানা সাপের দেবতা বিষহরি মনসাকে কিছুতেই দেবে না পুজো।"**[2] এর থেকেই শুরু হয় চাঁদবেনের সাথে মনসার দ্বন্দ্ব। আর বেদে সমাজের মধ্যেই আছে এই নাগিনী কন্যার কাহিনী। বেদেদের জীবন যাপনে সাপের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরা সাপের কামড়ে রুগীর চিকিৎসা করেন। কথিত আছে বিষহরি কৃপায় তারা ওই **"হিজল বিলের নাগনাগিনীর বিষ থেকে সূচিকা ভরণ তৈরি করতেন"**।[3] যা সাপের কামড়ের মৃত্যুঞ্জয়ী ঔষধ। লেখকের মতে **"হিজল বিলে মা মনসার আটন পাতা আছে - জনশ্রুতি মিথ্যা নয়।"**[4] কাহিনীতে দেখা যায় এক যুবক নাগকন্যার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে ভালোবাসে এবং তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাদের দাম্পত্য জীবন প্রথম দিকে ভালোই চলছিল কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের জীবনে ঘটতে থাকে কিছু অদ্ভুত ঘটনা। দেখা যায় কন্যাটি রাতে উধাও হয়ে যায়, আবার ফিরে আসে। এতে স্বামী সন্দেহ বশত তার পিছু নিয়ে জানতে পারে সে সাধারণ মানুষ নয়। সে আসলে নাগকন্যা। সে সাপ রূপে পরিবর্তিত হয়। তার প্রকৃত সত্তা হল যে সে হচ্ছে একজন সম্পূর্ণ রূপে একজন নাগকন্যা। এতে তার স্বামীর মনে ভীতির সঞ্চার হয়। তারা আর স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে না। এখান থেকেই দুজনের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। একদিকে স্ত্রীর প্রতি তার ভালোবাসা। অন্যদিকে তার অমানবিক রূপের প্রতি ভয়। সমাজের চোখেও এটা স্বাভাবিক ভাবে মেনে নেওয়া হয় না। তাকে "অন্য" বা ভয়ঙ্কর রূপে দেখা হয়। স্বামী বা সমাজ উভয়ই তাকে ধ্বংস করতে চায়। শেষে কন্যাটি নিজের জীবন দিয়ে কাহিনীর সমাপ্তি করে। কিন্তু এখানে আসলে নাগকন্যা কোনো সাপ - রূপ ছিল না। সবই রহস্য। এভাবেই একটি প্রেম কাহিনীর সমাপ্তি ঘটল - শুধুমাত্র সমাজ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারকারী মানুষের জন্য।

তারাশঙ্করের "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা" কাহিনীতে রয়েছে গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রা, তাদের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও দারিদ্রতা। তারা পুরনো রীতি নীতি আকড়ে ধরে অলৌকিক বিশ্বাসে আচ্ছন্ন। তারা অজানা জিনিসকে ভয় পায় নতুন কিছু যাচাই করে জানতে চায় না এবং তা গ্রহণও করতে চায় না। ফলে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থানগত কোনো পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা থাকে না। তাদের ব্যবহার উচ্চবর্গের সঙ্গে তাদের দূরত্ব বজায় থাকে। কিছু চরিত্র ধীরে ধীরে নতুন চিন্তাভাবনা গ্রহণ করে পুরানো ব্যবস্থা ভাঙার লড়াই করে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে। লেখক দেখাতে চেয়েছেন যে সমাজে পরিবর্তন অনিবার্য। যা কিছু খারাপ তা বর্জন করে নতুন গ্রহণ করতে হবে। তবেই সমাজের উন্নতি সম্ভব। আর যারা গ্রহণ করবে না নতুনকে তারা সব সময় পিছিয়ে পড়বে।

বিনা আগরওয়াল নারী ও পরিবেশের সম্পর্কে বলছেন - স্থানীয় বনায়ন বা পরিবেশগত সিদ্ধান্তে নারীরা যুক্ত থাকলে বনজ সম্পদের ব্যবহার ও সংরক্ষণ আরও বেশি সক্রিয় ও সুষম হয়। শুধু মাত্র নারীদের উপস্থিতিই যথেষ্ট নয় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বা কার্যকরী কমিটিতে নারীদের অবস্থান (৪০%) বা তার বেশি থাকলে আসল পরিবর্তন আসে। নারীদের ওপর পরিবারের ও সমাজের চাপের বোঝা থাকায় অনেক সময় তারা পরিবেশের সাধারণ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় পুরোপুরি অংশ নিতে পারে না।

বিনা আগরওয়ালের মতো গবেষকরা দেখিয়েছেন যে বন ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীদের অধিকার ন্যায়সংগত।

শিশির কুমার দাশ এই উপন্যাসটিকে ইতিহাস, জ্ঞান ও আখ্যান রচনার সমন্বয় রূপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তার মতে এটি একটি সামাজিক দলিল। তিনি বলেন উপন্যাসে বিষহরির সেবায় উৎসর্গকৃত শিরবেদের শাসন এবং তাদের অবলুপ্ত প্রায় জীবন যাত্রার নিখুত চিত্র ফুটে উঠেছে। লখিনদরের বাবা চাঁদ সদাগরের অভিশাপ থেকে শুরু করে হিজল বিলের বিষবৈদ্যদের জীবন এখানে পরবাস্তব কোনো কাহিনীর মতো মনে হলেও তারা রক্তমাংসের মানুষ। তার সাথে ফুটে উঠেছে বেদে সম্প্রদায়ের প্রথাগত বিশ্বাস ও আধুনিক চেতার পাশাপাশি ক্ষমতার দ্বন্দ্ব।

রামচন্দ্র গুহ হলেন একজন বিশিষ্ট ভারতীয় ইতিহাসবিদ। তিনি ভারত ইতিহাস আন্দোলন ও ধরন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন। তার মতে ভারতের পরিবেশ আন্দোলনের ধারা তিনটি তরঙ্গে বিভক্ত -

প্রথম তরঙ্গ:

তিনি বলেন, এটি মূলত স্থানীয় সম্পদ রক্ষা এবং বনবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষার সংগ্রাম। ঔপনিবেশিক আমল থেকে শুরু করে স্বাধীনতার পর পর্যন্ত যেখানে স্থানীয় মানুষ নিজেদের জীবন ধারণের জন্য অরণ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর অধিকার বজায় রাখতে বলেছে।

দ্বিতীয় তরঙ্গ:

এখানে তিনি বলেন এটি শিল্পায়ন ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ।

তৃতীয় তরঙ্গ:

তার মতে বর্তমান সময়ের পরিবেশ আন্দোলন, যা জলবায়ু পরিবর্তন, শহরের দূষণ ও পরিবেশ সংরক্ষণের ওপর জোর দেয়।

বন্দনা শিবা এর মতে, নারীরা প্রকৃতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, তাই প্রকৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হলে নারীরাও সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আধুনিক বিজ্ঞান ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া পুরুষ-কেন্দ্রিক, এটি প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে দেখে আর নারীদের অবমূল্যায়ন করে। বড় বড় কোম্পানি প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে, এর ফলে স্থানীয় কৃষক ও নারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বন্দনা শিবার ইকোফেমিনিজমে দেখানো হয় যে নারী ও প্রকৃতির শোষণ একই উৎস থেকে আসে। তাই পরিবেশ রক্ষা ও নারীর মুক্তি দুটোই একসঙ্গে ভাবতে হবে।

এই গবেষণায় বিভিন্ন সমালোচক ও বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে নাগিনী চরিত্রের প্রকৃতির সঙ্গে বিভিন্ন পথে মিল রয়েছে। যেমন - প্রকৃতির সুন্দরতা, শান্ত স্বভাব, আবার কখনো তার ভয়ঙ্কর রূপ এসবই নাগিনীর মধ্যে দেখা গিয়েছে। তাই এখানে নাগিনী প্রকৃতির প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। একই ভাবে প্রকৃতির তাণ্ডব রূপ ও নাগিনীর গোপন সর্প রূপ অর্থাৎ নারীদেহের সর্প রূপ সমাজে লোকের ভীতির কারণ হয়েছে। যদিও এই ভীতি স্বার্থপর লোভী ক্ষমতাবেনের দ্বারা সৃষ্ট। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই নারীকে সাধারণ থেকে অসাধারন বানিয়েছে। সমাজের চোখে ভয়ঙ্কর বানিয়েছে। প্রানীজ সম্পদ নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করে যেমন প্রকৃতিকে সর্বশেষ করার চেষ্টা করা হয় তেমনি নারীর স্বাধীনতা হরণ করে তার বাস্তবতা কেড়ে নিয়ে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করা হয়। এই গবেষণা সঠিক ভাবে চললে ভবিষ্যতে সমাজ জ্ঞানের আলো ফুটবে।

Conclusion:

সমাজ থেকে কুসংস্কার দূরীভূত করতে হবে ও ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থার উপর আরও বেশি জোর দিয়ে জ্ঞানের আলোক পরিস্ফুটিত করতে হবে। প্রকৃতি ও নারীর উপর বিবেচক দৃষ্টি রাখতে হবে। পরিবেশ রক্ষা করতে হবে এবং নারী মুক্তির কথাও ভাবতে হবে। মূল কথা শোষণের রাজনীতি নারী ও প্রকৃতি উভয়ে ক্ষেত্রেই বন্ধ করতে হবে।

Bibliography:

1. দেবী, মহাশ্বেতা, বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, সাহিত্য আকাদেমি, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৩।
2. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, নাগিনী কন্যার কাহিনী, www.bengaliebook.com।
3. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, www.bengaliebook.com।
4. আগরওয়াল, বিনা, Gender and Green Governance, https://www.bina।
5. দাশ, শিশির কুমার, ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, সাহিত্য আকাদেমি, প্রকাশকাল ১৮০০ - ১৯১০, ১৯১১ - ১৯৫৬।
6. গুহ, রামচন্দ্র, Environmentalism A Global History, New York Longman, 2000.
7. শিবা, বন্দনা, Ecofeminism, https://impact.com.

Endnotes:

1. নাগিনী কন্যার কাহিনী, Page No - 7
2. নাগিনী কন্যার কাহিনী, Page No - 24
3. নাগিনী কন্যার কাহিনী, Page No - 9
4. নাগিনী কন্যার কাহিনী, Page No - 9

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, conclusions, and opinions expressed in articles published in this journal are exclusively those of the individual author(s) and contributor(s). The publisher and/or editorial team neither endorse nor necessarily share these viewpoints. The publisher and/or editors assume no responsibility or liability for any damage, harm, loss, or injury, whether personal or otherwise, that might occur from the use, interpretation, or reliance upon the information, methods, instructions, or products discussed in the journal's content.

****